মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে সকল সুহৃদকে
বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা

# মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৪র্থ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৩

# মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে চলছে বিজয় উৎসব ২০২৩

*৯-১৬ ডিসেম্বর*

**৯ ডিসেম্বর ২০২৩**

গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস

## শাহরিয়ার কবির পরিচালিত ‘ভয়েস অব কনশান্স’ উদ্বোধনী প্রদর্শনী

একজন পাকিস্তানি তরুণী, আর একজন ১৯৭১-এ পাকিস্তানিদের গণহত্যার শিকার বাবা মায়ের কন্যা, দুজন দুজনকে আঁকড়ে ধরে আছে। শব্দ নয়, তাদের মুখের অভিব্যক্তি, চোখের জল বলে দিচ্ছে এই মুহূর্তে তারা একাত্মবোধ করছে। একজন তার পূর্বসূরিদের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত, আরেকজন সুন্দরী দাসী যে তার বাবা-মাকে মনে করতে পারে না, সে আজকে সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছে কেউ একজন তার বাবা-মায়ের হত্যাকারীদের দেশ থেকে তার কাছে এসেছে। না সুন্দরীর কোন অভিযোগ, রাগ, দুঃখ নেই। দৃশ্যটি শাহরিয়ার

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

**১০ ডিসেম্বর ২০২৩**

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস

## মানবাধিকার পরিস্থিতি: তারুণ্যের ভাবনা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তরুণ সংস্কৃতিকর্মী, নাট্যজন এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাকে নিয়ে প্যানেল আলোচনার আয়োজন করে। অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌসের সঞ্চালনায় এই আয়োজনে মানবাধিকার নিয়ে তরুণরা কী ভাবছে, বর্তমান বিক্ষুব্ধ বিশ্বে যখন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে লংঘিত হচ্ছে মানবতা, সেখানে সংস্কৃতির কী ভূমিকা থাকতে পারে সে বিষয়ে নাট্যজন মাসুম রেজা, সংস্কৃতি কর্মী ত্রপা মজুমদার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেন। আলোচনার সূচনায় অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেন দ্বিতীয়

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

**১১ ডিসেম্বর ২০২৩**

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহায়তায় নির্মিত

## প্রামাণ্যচিত্র ‘দ্য স্ক্র্যাপ’ উদ্বোধনী প্রদর্শনী

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এর ছয় দিনব্যাপী ‘বিজয় উৎসব ২০২৩’-এর তৃতীয় দিনে, গত সোমবার ১১ ডিসেম্বর বিকেলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহায়তায় নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র দ্য স্ক্র্যাপ (The Scrap)-এর উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ৪৮ মিনিটের এই প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছেন মাসউদুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত দশম লিবারেশন ডকফেস্ট ২০২২-এর অংশ হিসেবে আয়োজিত ‘এক্সপোজিশন অব ইয়াং ট্যালেন্টস’ কর্মশালার সেরা প্রামাণ্যচিত্র প্রকল্প হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। প্রামাণ্যচিত্রটির সহপ্রযোজক হিসেবে ছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## স্মরণে রবিউল হুসাইন : ২৫ নভেম্বর ২০২৩

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন স্মরণে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (আইএবি)-এর সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ আয়োজনে গত ২৫ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ স্মরণানুষ্ঠান। জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকেরের সঞ্চালনায় আয়োজিত স্মরণানুষ্ঠানে ‘স্থপতি রবিউল হুসাইন স্মারক বক্তৃতা ২০২৩’ প্রদান করেন অধ্যাপক স্থপতি মোহাম্মদ আলী নকী। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইএবি’র ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ। স্মৃতিচারণ করেন ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি। সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ট্রাস্টি মফিদুল হক। মিলনায়তনের বাহির অঙ্গনে রবিউল হুসাইনের স্মৃতিবিজড়িত ও আর্দশ বাহক ‘না’ পত্রিকার চারটি সংখ্যা প্রদর্শিত হয়। মূল অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ বলেন, আইবিএতে রবিউল ভাই আমার সহকর্মী ছিলেন। এর আগে মাজহারুল ইসলাম

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

# শাহরিয়ার কবির পরিচালিত ভয়েস অব কনশান্স-এর উদ্বোধনী প্রদর্শনী

**১ম পৃষ্ঠার পর**

কবির পরিচালিত ভয়েস অব কনশান্স প্রামাণ্যচিত্রের। মুক্তিযুদ্ধের ১৭ বছর পরে জন্ম পকিস্তানি লেখক আনাম জাকারিয়ার ২০১৭ সালে এসেছিলেন বাংলাদেশে, এসেছিলেন ১৯৭১ সম্পর্কে জানতে। তিনি জানান, যে সত্য তিনি তার দেশের পাঠ্যবইতে পাননি, সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, আলোচনায় পাননি সেই সত্য সন্ধানে তাকে বাংলাদেশে আসতে হবে। ১৯৭১-এ বাংলাদেশে সংঘঠিত গণহত্যাকে পাকিস্তান সরকার বরাবর অস্বীকার করে আসছে। কিন্তু সেই ১৯৭১ সাল থেকে পাকিস্তানের সচেতন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মীদের একাংশ জোরালো প্রতিবাদ করেছিলো বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের। প্রতিবাদ করে জেল জুলুমের শিকার হয়েছেন, তবুও বলে চলেছেন পাকিস্তান সরকারের বাংলাদেশের কাছে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মানুষের বক্তব্য নিয়ে শাহরিয়ার কবির তৈরি করেছেন ভয়েস অব কনশান্স। গত ৯ ডিসেম্বর, আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে প্রামাণ্যচিত্র ভয়েস অব কনশান্স-এর উদ্বোধনী প্রদর্শনির আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের। গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবসে অতি সম্প্রতি গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদে ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনসান্সের পাঠানো বিবৃতি তিনি পাঠ করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই সংগঠনের সদস্য। প্রামাণ্যচিত্র সম্পর্কে শাহরিয়ার কবির বলেন, ছবিটি বানাতে তার ১০ বছর সময় লেগেছে। তিনি চারবার পাকিস্তানে গিয়েছেন, এমন একটি কাজ পাকিস্তানে গিয়ে করার অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর ছিল না। বহুবার জীবনের ঝুকি নিতে হয়েছে, পাকিস্তানি ইন্টিলিজেন্স ব্রাঞ্চ (আইএসআই) তাকে হোটেল থেকে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছে, বাধ্য হয়ে তিনি পাকিস্তানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে থেকেছেন। এতকিছুর পরেও পাকিস্তানের মানবিক, সহানুভুতিশীল কিছু মানুষের জন্য তিনি কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন। তিনি উল্লেখ করেন ২০১৩ সালে তারা পাকিস্তানে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির শাখা গড়ে তোলেন, যার দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানের জনগণকে বাংলাদেশে গণহত্যা বিষয়ে জানানো এবং সেখানে জনমত তৈরি করা। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ যে গণহত্যার স্বীকৃতি চাইছে কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সেটি না চাইলে, পাকিস্তানের সরকার না চাইলে, আন্তর্জাতিক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হবে না। জাতিসংঘকে বাধ্য করতে হবে স্বীকৃতি দিতে, এজন্য পাকিস্তানিদের সহযোগিতা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আশা এবং হতাশা দুধরনের অভিজ্ঞতাই তিনি তুলে ধরেন। প্রথমত পাকিস্তানে যে স্বল্প সংখ্যক মানুষ চাইছেন বাংলাদেশ গণহত্যার স্বীকৃতি পাক, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুক, তারা নানাভাবে নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন পাকিস্তানে। কবি আহমেদ সালিম তার বাড়ি থেকে বের হতে পারেন না। আনাম জাকারিয়া বাংলাদেশে এসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, খুলনার গণহত্যা আর্কাইভস ও জাদুঘর পরিদর্শন করে, বিভিন্ন বধ্যভূমি পরিদর্শন করে দেশে ফিরে গিয়ে ৪০০ পৃষ্ঠার বই প্রকাশ করে, যার ফলে তাকে পাকিস্তান ছেড়ে কানাডায় চলে যেতে হয়। এগুলো হতাশার, তবে আশার কথা ২০১৩ সালে পাকিস্তানে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি একটি জনমত জরিপ চালায়, সেই জনমত অনুসারে পাকিস্তানের ৩.৬ শতাংশ জনগণ মনে করতো ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা চালানোর জন্য পাকিস্তান সরকারের ক্ষমা চাওয়া উচিত, ২০২১ সালে একই জরিপ চালানো হলে দেখা যায় শতকরা ৩৪ জন মনে করছে পাকিস্তানকে

আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাইতে হবে। কাজেই আমাদের পক্ষে জনমত বাড়ছে। পাকিস্তানের তরুণ প্রজন্ম জানছে মুক্তিযুদ্ধের কথা, সেটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে, জেনোসাইড স্কলারদের মাধ্যমে, পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, গণহত্যা আর্কাইভস কাজ করছে এ বিষয়ে। ফলে বাংলাদেশের গণহত্যা একদিন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে এটা শাহরিয়ার কবির দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

মুক্তিযুদ্ধ গবেষক, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, এ ধরনের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে পাকিস্তানের বাধার কথা বাদ দিয়েও বলা যায় বাংলাদেশের ভেতরেও অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে, দেশেও অনেকে সহায়তা করে না, ভয় পায়। এদের মধ্যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগুণীজনও আছেন। ৪০ বছর নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে, শাহরিয়ার কবির মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষায় সারা জীবন ব্যয় করে দিল, ফলে এমন ছবি তৈরি হচ্ছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে। তিনি বলেন ভারতীয় উপমহাদেশে এখন '৭১ ফিরে এসেছে, প্রতি দশটি ছবির মধ্যে একটি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত হচ্ছে। সেইসব ছবিতে অদ্ভূত অদ্ভূত কাহিনী আছে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ দেখানো হচ্ছে, বাংলাদেশ অনুপস্থিত। পাকিস্তানে যে চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে সেখানে অসম্ভব অসম্ভব বিষয়কে দেখানো হচ্ছে। নতুন করে ইতিহাসের বিকৃতি শুরু হয়েছে। ভারতের কোন লেখায় তারা মেনে নিতে চায় না যে যৌথ কমান্ডের অধীনে যুদ্ধ হয়েছে। তিনি মনে করেন গণহত্যার স্বীকৃতির দুটো দিক আছে, প্রথমত রাষ্ট্র কর্তৃক বলা বা পার্লামেন্টের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। দ্বিতীয়ত ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে তার মত হচ্ছে, যখন বিশ্বজুড়ে গণহত্যার কথা আলোচনা হবে তখন বাংলাদেশের কথা আলোচনা হবে, তাদের মিডিয়া, তথ্যকেন্দ্র গত ৫০ বছরের নীরবতা কাটিয়ে বলবে '৭১-এ বাংলাদেশে গণহত্যা হয়েছিলো। এটাও স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি এখন পাওয়া যাচ্ছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা, সংস্কৃতিজন নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু বলেন, শাহরিয়ার কবির গণহত্যা নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করছেন ১৯৯৮ সাল থেকে। গত ২৫ বছরে তিনি থামেননি। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে তিনি সবসময়ে সোচ্চার, তার এই নিরলস প্রচেষ্টার জন্য তার প্রতি সবার ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা। তিনি মনে করেন, ৭১-এর গণহত্যা, মায়ানমারের রোহিঙ্গা গণহত্যা, গাজার গণহত্যা, এগুলো অস্বীকার করার উপায় নেই, এগুলোর বিচার হচ্ছে না, এগুলো জাতিসংঘ, মার্কিনী বা পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অস্বীকারের সংস্কৃতির সূত্রপাত বাংলাদেশের গণহত্যা দিয়ে। এর বিপরীতে প্রয়োজন ইতিহাসের সত্যভাষণ সামনে আনা, যেটি ভয়েস অব কনশান্সে আছে। এই কাজ বৃথা যাবে না।

# প্রামাণ্যচিত্র 'দ্য স্ক্র্যাপ'-এর উদ্বোধনী প্রদর্শনী

**১ম পৃষ্ঠার পর**

অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম নির্মাতা মাসউদুর রহমান ও জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হককে মঞ্চে ডেকে নেন। মফিদুল হক অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর সম্প্রতি প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা নৌ কমান্ডো হুমায়ূন কবির স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রদর্শনীটিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নৌ- কমান্ডো, প্রামাণ্যচিত্রটির কলাকুশলী, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাকর্মীসহ আরো অনেকে।

প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরি হয়েছে পাকিস্তানি জাহাজ 'এমভি ইকরাম'-কে কেন্দ্র করে। ১৯৭১ সালের ৩০শে অক্টোবর বাংলাদেশের নৌ কমান্ডোর একটি দল মাইন বিস্ফোরণের মাধ্যমে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দিয়েছিল চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদীতে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এই জাহাজটির মালিকানা অনেকবার রদবদল হয়। অবেশেষে ৩৭ বছর পর বীর মুক্তিযোদ্ধা বশির আহমেদের তত্ত্বাবধানে ২০০৮ সালে মুক্তিযুদ্ধের এই স্মৃতি বিজড়িত জাহাজটি উদ্ধার করা হয়। তবে জাহাজটি উদ্ধার করা হলেও সেটি সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বরং পোহাতে হয়েছে নানা রকম দুর্ভোগ। মূলত এসব বিষয়গুলোই চিত্রিত হয়েছে 'দ্য স্ক্র্যাপ' প্রামাণ্যচিত্রে।

প্রদর্শনী শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান কবির এবং বশির আহমেদ তাদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন, তারা তাদের জীবদ্দশায় জাহাজটিকে সংরক্ষণ হতে দেখে যেতে চান। তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা নিয়ে তারা যুদ্ধ করেছিলেন তা যেন আংশিক হলেও বাস্তবায়ন হয়। প্রামাণ্যচিত্রের নির্মাতা মাসউদুর রহমানও একই আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, নির্মাণ করতে গিয়ে তাকে অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তবুও তিনি পিছপা হননি। তিনি চেয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের এই বীরত্বগাথা তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে যাতে তারা এ বিষয়ে জানতে পারে এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

সমাপনী বক্তব্যে ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর খুবই আশাবাদী যে মুক্তিযুদ্ধের এরকম অসাধারণ একটি স্মারক দেশবাসী জলে ডুবে যেতে দিবে না। তিনি আরও বলেন যে, এই জাহাজটি সংরক্ষণ করতে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই এক্ষেত্রে তিনি গণমাধ্যমকর্মী ও তরুণ প্রজন্মসহ সকলকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

**কারিমা**
স্বেচ্ছাকর্মী, চলচ্চিত্র কেন্দ্র

# শান্তি, মুক্তি ও স্মৃতি রক্ষা

অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৩

গত একমাসে আমি বিশ্বের দুই প্রান্তে দু'টি সম্মেলনে যোগ দিয়েছি। এই দু'টি সম্মেলনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার মূল্য আমার কাছে অনেক। ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনশান্স, এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস-এর সাথে আরো কয়েকটি সংগঠনের আয়োজনে প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ব্যাংককে ১২ থেকে ১৬ অক্টোবর ২০২৩। সহিংসতার মোকাবেলায় আরেকটি সহিংসহতা নয় বরং সহিংসতার মিমাংসায় প্রয়োজন বিরূপ মনোভাব কাটিয়ে ওঠা মানুষের মধ্যে এমন দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করাই ছিল এই সম্মেলনের লক্ষ্য। যেহেতু সবার প্রধান বিবেচ্য ছিল ট্রানজিশনাল জাস্টিস এবং ক্ষতিপূরণ, তাই প্রতিটি আলোচনায় অতীত ক্ষতকে মুছে দিয়ে ঘৃণাত্মক বক্তব্যের অবসান ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

*ব্রাজিলের রিওতে বিশ্ব নারী সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সাথে সারা যাকের*

'বিশ্বের নারী' (Women of the World- WOW) উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে। জাতি-গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অবস্থানে থাকা নারীর সাফল্য এবং প্রতিবন্ধকতাকে উদযাপন করে এই 'বিশ্বের নারী' উৎসব। এই উৎসবে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এমন কি LGBTQ+ সমাজের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা হয়। রিওতে প্রতিটি আলোচনায়, পরিবেশনায়, শিল্পকলার প্রদর্শনীতে নারীর জয় এবং বাধা নিয়ে কথা বলা হয়েছে।

যখন ব্যাংককের কনফারেন্সে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তখন আমার একজন সিনিয়র সহকর্মী বলেছিলেন, বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে যারা আসবেন তাদের সাথে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব। আমার জন্য তার পরামর্শ ছিলো একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরির জন্য অতীতে ঘটে যাওয়া সংগ্রাম ও নৃশংসতাকে বর্তমান বাস্তবতার সাথে মেলাতে হবে; হতে পারে সেটি কয়েক দশক আগে ঘটে যাওয়া অতীত কিংবা দু'চার বছর বা দু'সপ্তাহ আগে ঘটা, যেমনটা ঘটেছে বাংলাদেশের কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে।

যেমনভাবে, আজকের রোহিঙ্গা গণহত্যা অনেকাংশেই স্বীকৃতি পাচ্ছে না, ঠিক তেমনি ভাবে ৫০ বছর পার হয়ে গেলেও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যে গণহত্যা হয়েছিল সেটিও স্বীকৃতি পায়নি। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ড পাকিস্তানি বাহিনীর নীল নকশার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশ্বের কাছ থেকে ১৯৭১-এর গণহত্যার স্বীকৃতি লাভের জন্য বিশেষভাবে জাতিসংঘের স্বীকৃতির জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো আজও কাজ করছে। আর যখন আমরা বাংলাদেশে হওয়া গণহত্যার স্বীকৃতি চাইছি, তখনই আমাদের সামনে কিছু প্রশ্ন চলে আসছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গারা কেমন আছে? বিহারীদের কী অবস্থা? আমাদের দেশের আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ কী?

যখন মাথায় এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল, তখন এক বুক শঙ্কা নিয়ে কম্বোডিয়ার এক প্রতিনিধির কাছে জানতে চাইলাম, কেন একজন খেমার রুজ সদস্য যে ১৯৭৫ সালে সরাসরি হত্যা এবং নৃশংসতার সাথে যুক্ত ছিল, তারপরও সে তার নিজের কৃতকর্মের বিচার চাইছে! এটাই মানব চরিত্র, একজন অপরাধীও ভেবে নেয় সে পরিস্থিতির শিকার। তারা তাদের কৃতকর্মের যৌক্তিকতা এভাবে দিতে চায় যে, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণসহ তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যারা ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতায় ছিল তাদের কৌশলগত নীতিরই অংশ ছিলো। তারা মনে করে যুদ্ধে অতি ক্ষমতাধরদের হাতের ক্রিড়ানক ছিলো তারা। সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে আমরা যে কোন ঘটনার বিচার করি ভালো এবং মন্দ হিসেবে। আমাদের জন্য অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে একজন খেমার রুজ অপরাধীর আত্মগ্লানি, যেমন অবিশ্বাস্য একজন পাকিস্তান আর্মির এক বাঙালি তরুণীর প্রেমে পড়া (যেমনটি মেহেরজান চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে)। আবার মেহেরজান একজন বীরাঙ্গনা, সে

*ব্যাংককে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সাথে সারা যাকের*

সিদ্ধান্ত নেয় একজন পশতু সেনার স্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানে চলে যাবার, যে সেনাটি তাকে বারবার ধর্ষণ করেছে। নীলিমা ইব্রাহিমের 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' ঘটনা প্রবাহ থেকে সত্য ঘটনাকে এক ধরনের আপোষরফা বলে মনে করা হয়। বারবার নিজের বিবেককেই প্রশ্ন করি, কীভাবে এই ঘটনাটি সাহসীকতার প্রতীক কাহিনী হিসেবে গণ্য হতে পারে?

আমরা একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার চেষ্টা করি, যেখানে মেহের ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে। মেহের কোন পাশতু সেনার বিরুদ্ধে লড়ছে না, তার লড়াইটা বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সমাজের বিরুদ্ধে। দু'টি দেশেই পিতৃতন্ত্র প্রধান দেশ। পশতু সেনা বৃদ্ধ হলে তার গ্রামে স্ত্রী-সন্তানের কাছে ফিরে যায়। করাচীতে বসবাসকারী একজন বাঙালি নারী মেহেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। কঠোর পরিশ্রম আর নিষ্ঠা দিয়ে মেহের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। ১৯৯০-এ মেহের এক সম্মেলনে যোগ দিতে বাংলাদেশে আসে। আপাতদৃষ্টিতে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হবে, কিন্তু একটু গভীরে গেলে আমরা এক লজ্জার ইতিহাস পাব। যদিও সে তার কথা বলার জন্য একটি মঞ্চ পেয়েছিল কিন্তু তিক্ত সত্য হলো ধর্ষণের ঘটনা তার শরীরে ও চরিত্রে যে দাগ ফেলেছিলো, তা সমাজের কাছে এখনও প্রতীয়মান। ফলে তাকে নিজের ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যেতে হয় গোপনে, আবার নিজেকে আঁধারে ঢেকেই সে ফিরে যায়, যেন তার কোন অস্তিত্বই নেই। মেহের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী কিন্তু আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ একবার যে নারীকে পতিত হিসেবে দেখে তাকে কোনভাবেই মেনে নেয় না।

রিওতে বিশ্ব নারী সম্মেলনে আমি অসংখ্য মেহেরের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে শুনেছিলাম। পুরো বিশ্বজুড়ে নারীরা সেই একই বিষাক্ত পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছি। আমরা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপালের নারীরা একসাথে একসুরে, পিতৃতন্ত্র এবং বৃটিশ উপনিবেশবাদের সাথে মোকাবিলার ইতিহাস বলছিলাম। একটি প্যানেলে আলোচনার বিষয় ছিল, 'পুরুষেরা কী ভাবছে?' প্যানেলটিতে আগ্রহ নিয়ে যোগ দিলাম। এই প্যানেলে রিও-এর favela-গুলোত (favela-নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসন) কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের দ্বারা নারীদের নির্যাতনের ঘটনার কথা বলা হচ্ছিল। একজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ আলোচক যেখানে পুরুষ সহিংসতার যুক্তি হিসেবে বললেন, favela-এর একজন কৃষ্ণাঙ্গ বালক নিপীড়নের শিকার হয়, যা তার জীবনকে আতঙ্কগ্রস্থ করে তোলে, ফলে সেও সহিংস হয়ে ওঠে। একজন পুরুষ শিকার হচ্ছে অপর পুরুষের ঘৃণার। যখন এই ব্যক্তি নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছিল এবং বলছিলো যে কীভাবে সে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে, তখন মনে হচ্ছিল, উত্তরাধিকারসূত্রে যে ভয়াবহ স্মৃতি বা যন্ত্রণা আমরা বহন করি সেটিই পুরো সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বিশ্ব সংহিংসতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, আর এই চক্র বয়ে চলছে যুগ যুগ ধরে সব সমাজে এবং বৈষম্যভরা বিশ্বে। ভাবুন তাহলে সেই নারীদের কী হবে, যারা এমন ঘৃণার সবচেয়ে দুর্বল শিকার? যে ঘৃণা ছড়ানো হয় ধর্মের নামে, নৈতিকতা বা মূল্যবোধের নামে অথবা দেশপ্রেমের নামে। মনে পড়ছে Johan Galtung-এর একটি উক্তি, তিনি ১৯৬৯-এ প্রকাশিত Violence, Peace and peace studies গ্রন্থে বলেছিলেন, 'যখন একজন স্বামী তার স্ত্রীকে পেটায়, তখন সেটি স্পষ্টভাবে ব্যক্তিগত সহিংসতা, কিন্তু যখন লক্ষ স্বামী লক্ষ স্ত্রীকে অবহেলা করে ঘরে বন্দি করে রাখে তখন সেখানে সুস্পষ্ট কাঠামোগত সহিংসতা সংঘটিত হয়।' এর সাথে যুক্ত করে আমি বলি, যখন লাখ পুরুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের শৃঙ্খলিত করে, তার কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে, তার মৌলিক অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে, সেটিও সুনির্দিষ্টভাবে সংঘটিত সহিংসতা। এভাবেই সহিংসতা নারীর দুর্গতির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নারীর এই ভাষ্য আমাদের ধরে রাখতে হবে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে।

মনে পড়ছে আমার মায়ের একটি শালের কথা, ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে বোনা শালটিতে তিনি একটি দোয়া হাজার হাজার বার বুনেছিলেন তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পেতে। আমার ভাই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে গিয়েছিলো আর ফিরে আসেনি। যাবার পথে আমার ভাই আর তার বন্ধু খসরুকে ইপিআরের সৈন্যরা আটকেছিলো। আমার ভাই ছিল লম্বা, ফর্সা এবং কটা চোখের, ইপিআর সৈন্যরা তার পরিচয় জানতে চাচ্ছিল। তাদের ধারণা হলো চিংকু ভাইয়া (আমার ভাই) মিথ্যে পরিচয় দিচ্ছে, সে আসলে পশ্চিম পাকিস্তানি। তারা চিংকু ভাইকে বেধে ফেলে এবং মেরে ফেলতে চায়, খসরু ভাই তাদের বারবার অনুরোধ করে ভাইকে ছেড়ে দিতে। খসরু ভাই এরকম কিছু বলেছিল 'যদি চিংকু দেশপ্রেমিক না হয়, তাহলে আমিও দেশপ্রেমিক না, আমাকেও ধরে নিয়ে যাও'। পরে দেখা গেলো সৈন্যদের মূল উদ্দেশ্য লুঠ করা। তারা লুঠ করে এবং চিংকু ভাই ও খসরু ভাইকে হত্যা করে। এভাবে দুটো মূল্যবান জীবনের সমাপ্তি ঘটলো।

৭১-এর ৪৫ বছর পরে ২০১৬ সালে হলি আর্টিজানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে খসরু ভাই যেন ফিরে এলেন ফারাজ হয়ে। ফারাজও তার বন্ধুদের সাথে ছিল এবং তাদের সাথেই ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়, স্বেচ্ছায় জীবন উৎসর্গ করে। একটি আত্মত্যাগ যা মনবতাকে আশা দেখায়।

এতক্ষণ বলে যাওয়া ঘৃণাত্মক পিতৃতান্ত্রিক কাহিনীর বিপরীতে মেহেরের বীরত্বের কাহিনী রয়েছে, যেমন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে, পাশাপাশি ৭১-এ খসরু ভাইয়ের কাহিনী রয়েছে, যেমন আছে ২০১৬-তে ফারাজের কাহিনী।

ধর্মের নামে ছড়ানো নিষ্ঠুর বিষাক্ত ঘৃণা যেমন আছে তেমন রয়েছে আপোষহীন সাহসী বীরেরা। আসুন আমারা প্রতিনিয়ত স্মৃতিতে ধরে রাখি সেই বীর নর-নারীদের। তাদের স্মরণ যেন আমাদের বলে চলে মানবতার কথা। আসুন আমরা আমাদের সমাজকে গড়ি শান্তি এবং সহমর্মিতা দিয়ে, তাহলে আমরা পাব এক অবিচ্ছিন্ন সুন্দর পৃথিবী।

**সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

# স্মরণে রবিউল হুসাইন

**১ম পৃষ্ঠার পর**

স্যারের অফিসেও আমরা এক সাথে কাজ করেছি। খুব কাছ থেকে মানুষটাকে দেখেছি। ভীষণ অমায়িক একজন মানুষ। রবিউল ভাই বাঙালি মানসপট পরিপূর্ণভাবে ধারণ করতে পেরেছিলেন। খুব সহজ এবং একই সাথে ভীষণ দৃঢ়। উনি নিজেকে আড়াল করে কাজ করে গেছেন সারাজীবন। এখন আমাদের দায়িত্ব ওনাকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা। এরপর বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি। তিনি তার স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে বলেন– রবিউল হুসাইনের মতো দ্বিতীয় মানুষটি আমি দেখিনি। নিজের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে এতাটা উদাসীন মানুষও আমি আর দেখিনি। সৃজনশীল এবং কর্মঠ। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তার সাথে আমার পরিচয় ও সখ্যতা। তারপর তো দীর্ঘ দিনের পথচলা। বক্তব্য শেষে আসাদুজ্জামান নূর কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন রচিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন। বরিউল হুসাইন রচিত বিখ্যাত কবিতা 'এক সেকেন্ডে মাত্র চারফুট' আবৃত্তির মধ্যদিয়ে আসাদুজ্জামান নূর তার বক্তব্য শেষ করেন। 'স্থপতি রবিউল হুসাইন স্মারক বক্তৃতা ২০২৩' প্রদান করেন বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (আইবিএ)-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী নকী। তিনি বলেন– একটি স্মারক বক্তৃতায় সাধারণত স্মরণ করা হয় একজন ব্যক্তিকে। কিন্তু আজকে আমি স্মরণ করবো একটি স্বপ্নকে। কারণ এই স্বপ্নটাকে না বুঝলে আমরা রবিউল হুসাইনকে বুঝবো না। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, আজকে আমরা আমাদের কাছের মানুষ, প্রিয় মানুষ রবিউল হুসাইনের স্মরণে মিলিত হয়েছি। এই অনুষ্ঠান যৌথভাবে যে দু'টি প্রতিষ্ঠান আয়োজন করেছে, এই যৌথতার নির্মাতা ছিলেন রবিউল হুসাইন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেগুনবাগিচা থেকে আজকের আগারগাঁওতে সেই যৌথতার ছাপ বিদ্যমান। গতবছর থেকে আমরা আইএবি-এর সঙ্গে এই স্মারক বক্তৃতাটি প্রবর্তন করি। আইএবি-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে যে বিশাল উদযাপনের আয়োজন ছিল সেখানে প্রথমবারের মতো স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন আমেরিকান প্রথিতযশা স্থপতি ও মিউজিয়াম ডিজাইনার বারবারা ফার্স চার্লস্। অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী নকী অত্যন্ত চমৎকারভাবে রবিউল ভাইকে অন্য দৃষ্টি থেকে বৈশিষ্টপূর্ণভাবে তুলে ধরলেন। আমার মনে হয়, স্থপতি ইনস্টিটিউট কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণে যুক্ত ছিল, সেটা কোথাও একটা লিখিত থাকা দরকার। আজকে স্থপতি মোবাশ্বের হোসেনের কথাও আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। রবিউল হুসাইনের সংগ্রহ থেকে আমরা 'না' পত্রিকার তিনটি সংখ্যা পেয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক নজরুল ইসলামের কাছ থেকে আরেকটি সংখ্যা পেয়েছি, যেটা হচ্ছে গদ্য সংখ্যা। 'না' পত্রিকার সূত্র ধরে আজকে আমরা তাজু চৌধুরী, রশিদ চৌধুরী, কাজী শাহিদ হাসানের মতো মানুষদের স্মরণ করতে চাই। 'না' পত্রিরকার দ্বিতীয় সংখ্যার উৎসর্গে আমরা দেখতে পাই স্বাতী চৌধুরীর নাম। এই স্বাতী চৌধুরী আর কেউ না, সেগুন বাগিচায় যে বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যাত্রা শুরু করেছিল সেই বাড়ির মানুষ এই স্বাতী চৌধুরী। প্রতি বছর রবিউল হুসাইনকে যখন আমরা স্মরণ করবো তার নতুন নতুন আঙ্গিক আমরা মেলে ধরতে পারবো। রবিউল হুসাইন আমাদের শক্তি যুগিয়ে যাবেন।

প্রতিবেদন: শরীফ রেজা মাহমুদ

# মানবাধিকার পরিস্থিতি : তারুণ্যের ভাবনা

**১ম পৃষ্ঠার পর**

বিশ্বযুদ্ধে ১ কোটি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিলো। এই হত্যাযজ্ঞের পর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ জাতিসংঘ থেকে পেশ করা হয় এবং জতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এতে সম্মতি প্রদান করে। আজকে আমরা গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদ করছি, এখানে দেখবার বিষয় হলো, যখন আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস পড়ি, তখন সবচেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল হই ইহুদীদের জন্য, মানবতার ইতিহাসে এত নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা এর আগে হয়নি। ইহুদী জাতির ৮০ শতাংশকে হিটলার নিশ্চিহ্ন করেছিল। সেই ইহুদিরা ১৯৪৮ সালে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলো, সেই ইসরায়েল এখন গাজায় নির্মমতা চালাচ্ছে, আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, যে প্রশ্নটি আসে বা বুঝবার যে বিষয়টি সেটি হলো একসময়কার নিপীড়িত নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় কেন? কেন তারা সংবেদনশীল হয় না?

নাট্যজন মাসুম রেজা বলেন, ১৯৪৮ সালে যখন মানবাধিকারের সনদ গৃহীত হয়, সেই সময় থেকেই কিন্তু ফিলিস্তিনের সমস্যা শুরু হয়, যখন একটি জাতিসত্ত্বা বা একটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রসঙ্গ আসে, তখন একজন ব্যাক্তির নিজস্ব নিপীড়নের বিষয়টি থাকে না, সেটি একটি সামগ্রিক বিষয় হয়ে ওঠে, এর সাথে যুক্ত হয় ভূ-রাজনীতি, ভূখন্ডের অধিকারের প্রশ্ন। ইহুদীদের এই নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার পেছনে রয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি। আমরা দেখছি যে জাতিসংঘের যুদ্ধ বিরোধী প্রস্তাবে ভেটো আসছে এমন একটি রাষ্ট্রের কাছ থেকে যারা সারা দুনিয়ায় মানবতার কথা বলে। ১৯৪৮ সাল থেকে বারবার বলা হচ্ছে যে ফিলিস্তিনীরা শান্তি চাচ্ছে না, যেহেতু তারা শান্তি চায় না, তাদেরকে শান্তি রক্ষার জন্য মরতে হবে, তাদের ধ্বংস করতে হবে, নিশ্চিহ্ন করতে হবে। জানি না এটা কী ধরণের শান্তি প্রচেষ্টা। এর সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং ভূ-রাজনীতি জড়িত। যে রাজনীতি মূলত মানবাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করবে, পথ প্রদর্শন করবে মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য, সেই রাজনীতিই এখন মানবাধিকারের বিপরীতে

দাঁড়িয়ে কাজ করছে। এখানেই মূল সমস্যা।

অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস তার অভিমত প্রকাশ করে বলেন, রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত সংস্কৃতি আর রাজনীতি হবে সেই লক্ষ্য অর্জনের উপায়। কিন্তু সেই রাজনীতি আর সংস্কৃতিকে আমরা দুই ভূবনের বাসিন্দা বানিয়ে ফেলছি। ফলে দুটোকে আমরা মেলাতে চাই না। যে বাঙালি ২৪ বছর পাকিস্তানে জাতিগত নিপীড়নের শিকার হয়েছে, ভাষাগত নিপীড়নের শিকার হয়েছে, সামরিক নিপীড়নের শিকার হয়েছে, স্বাধীনতার ৫২ বছর পরে দেখি আদিবাসী বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা লঙ্ঘন করছে। তিনি জানতে চান এখানে সংস্কৃতি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

চলচ্চিত্র নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত বলেন, একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা সমাজের কথা বলে, চলচ্চিত্র তার মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম। একজন সত্যিকারের নির্মাতা যখন সমাজের কথা বলেন তখন মানবাধিকারের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারেন না। আমাদের সার্বিক সংস্কৃতি চর্চায় মানবাধিকার কতটুকু উঠে আসছে সেটি নিয়ে প্রশ্ন হতেই পারে। দেখা যায় যে সকল চলচ্চিত্র সমাজের কথা বলে, মানুষের কথা বলে, বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের কথা বলে, সে সব চলচ্চিত্র পপুলার প্লাটফর্মে ঠাই পায় না, খ্যাতি পায় না। বছরের পর বছর, দশকের পর দশক এমন চর্চার ফলে সাম্প্রদায়িকতা, অন্ধ বিশ্বাস সমাজে শেকড় গেড়ে বসে। আপাত দৃষ্টিতে শান্তিপূর্ণ সমাজ মনে হলেও ভেতরে ভেতরে সাম্প্রদায়িকতার ঘুনপোকা বাসা বাঁধে।

সংস্কৃতিকর্মী ত্রপা মজুমদার বলেন, ইদানিংকালে মানবাধিকার শব্দটি শুনলে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু বলে মনে হয়। অথচ জন্মানো মাত্রই প্রতিটি প্রাণের মানবাধিকার পাওয়া নিশ্চিত হয়। তিনি বলেন মানবাধিকারের সনদ একটি প্রতিশ্রুতি ছিলো, রাষ্ট্রগুলো বলেছিলো আমরা এটা পালন করবো, আমরা এটা অনুসরণ করবো। এটা প্রতিশ্রুতি, কোনো আইনের আওতায় একে আনা হয় নি। ফলে প্রতি পদে পদে এটি ভঙ্গ হচ্ছে, জাতিসংঘও কিছু করতে পারছে না। তিনি মনে করেন সংস্কৃতি বলতে বুঝায় সম্পূর্ণ জীবনাচারণ, জীবনাচারণে যখন সংস্কৃতি আসবে, যখন কেউ মানুষকে মূল্য দিতে শিখবে, প্রকৃতিকে-প্রাণীকূলকে মূল্য দিতে শিখবে তখনই কাঙ্খিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই শিক্ষা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বা পুথিঁগত বিদ্যা দিয়ে অর্জন সম্ভব না, এটা অনুভব করার বিষয়, এখানেই সংস্কৃতির মূখ্য ভূমিকা। আমারা সেই গল্পকে সমাজের কাছে নিয়ে যেতে পারছি না, যেটা সমাজের চিন্তাবদলে ভূমিকা রাখতে পারবে। সমাজকে সহানুভূতিশীল হতে শেখাবে। সেই সংস্কৃতি চর্চাই সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠা উচিত, মানবাধিকার যে চর্চার মধ্য দিয়ে একজন স্বভাবতই অন্য মানুষের অধিকার বা মানবাধিকারকে সম্মান করতে শিখবে। সংস্কৃতি চর্চা আমাদের শেখাতে পারে অন্যতাকে, ভিন্নতাকে, অপরত্বকে মেনে নিতে।

# স্মরণে রবিউল হুসাইন : জল্লাদখানায় স্থপতিবৃন্দ

‘কান পেতে শুনি কি বলতে চাইছে জল্লাদখানা বধ্যভূমি’ বাক্যটি চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন জল্লাদখানা বধ্যভূমির সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া হাজারো পথিক। পথিকের মনে উদ্ভূত প্রশ্নের উত্তরটিও রয়েছে সেখানে। ‘একাত্তরের গণহত্যা ও শহীদের কথা বলবে শতকণ্ঠে জল্লাদখানা বধ্যভূমি’। মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠটির নকশা করেন স্থপতি ও ট্রাস্টি রবিউল হুসাইন। ২০১৯ সালের ২৬ নভেম্বর যাকে হারিয়েছি আমরা চিরদিনের মতো। মানুষ বেঁচে থাকেন কর্মের মধ্যে। রবিউল হুসাইন ঠিক তেমনভাবে বেঁচে আছেন। তার অসংখ্য স্থাপত্যকর্মের মধ্যে মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধে শহীদের স্মৃতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য জল্লাদখানা এক অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন। কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন স্যারের ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণানুষ্ঠানের অংশ হিসেবে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পরিদর্শনে আসেন রবিউল স্যারের দীর্ঘদিনের কর্মস্থল বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর সাবেক প্রেসিডেন্ট স্থপতি আবু সাঈদ এম আহমেদ সহ তার সহকর্মীবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন জল্লাদখানায় নিহত শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ। প্রদর্শক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক। জল্লাদখানা বধ্যভূমির ভিতরে প্রবেশকে রবিউল স্যার বলতেন স্মৃতির পুকুরে প্রবেশ করা। কারণ এটি মূল রাস্তা থেকে অনেকটা নিচু। ঠিক পুকুরের মত। ত্রিভুজ আকৃতির সবুজ দূর্বাঘাসে আবৃত বেদীর বামপাশ হতে শুরু হয় পরিদর্শন। চারপাশে শ্বেতপাথরে খোদাই রয়েছে সমগ্র বাংলাদেশের ৪৭৭ টি বধ্যভূমির তালিকা, বিভাগ অনুসারে সংরক্ষিত ৬ টি বধ্যভূমির মাটি। জল্লাদখানার মধ্যভাগে রয়েছে শিল্পী রফিকুন নবীর নকশায় নির্মিত ম্যুরাল ‘জীবন অবিনশ্বর’ । ম্যুরালের ঝামা ইটগুলো জল্লাদখানার অন্ধকূপে ফেলে দেয়া অসংখ্য শহিদের মৃতদেহের স্তূপের বিমূর্ত প্রতীক। তারপরই রয়েছে বিশ শতকের গণহত্যার তালিকা। আর্মেনিয়া, নাৎসি জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, কাম্বোডিয়া, পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়া, রুয়ান্ডা, আফগানিস্তান, গুয়াতেমালা, পূর্ব তিমুর এবং সুদান। তালিকার শেষে ‘চলছে.....’ শব্দটি আমাদের কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড় করায়। আমাদের ভাবায় পৃথিবীতে এখনো গণহত্যা চলছে। তবে সর্বশেষ কালো পাথরে লাল

রঙে বড় হরফে লেখা ‘STOP GENOCIDE’. মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত এই চলচিত্রের পরিচালক ছিলেন জহির রায়হান। যিনি তাঁর বড় ভাই বুদ্ধিজীবী শহিদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে নিখোঁজ হন। তারপর সবাই এসে দাঁড়ালেন সেই বিভৎস পাম্প হাউসের ঘরের সামনে। ছয়টি ভাষায় লেখা আছে কি ঘটেছিল এখানে? ভিতরে প্রবেশ করতেই কালো টাইলস বসানো জায়গাটি সবার আগে চোখে পড়ে যেটি মেঝে থেকে কার্নিশ পর্যন্ত । মনে হয় একটি বৃত্তের মতো। রবিউল হুসাইন নাম দিয়েছিলেন ‘দুঃখবৃত্ত’। মেঝের কালো জায়গাটিতেই নির্মমভাবে হত্যা করা হত অসংখ্য বাঙালিকে। ত্রিশ ফিট গভীরের এই পাম্প হাউস থেকে খনন করে উদ্ধার করা হয় শহীদের ৭০ টি করোটি এবং ৫,৩৯২টি অস্তিখন্ড। জল্লাদখানা বধ্যভূমি এবং নূরী মসজিদ থেকে উদ্ধারকৃত কিছু স্মারক প্রদর্শিত হয়েছে সেখানে। পাশের দেয়ালে রয়েছে শহীদের নামের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা। পাম্প হাউসের উপর বসানো কাঁচের গ্লাসে লেখা আছে ‘নীরবে শ্রদ্ধা নিবেদন করি সকল শহীদের প্রতি’। সেখানে নিহত শহিদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন অতিথিবৃন্দ। রবিউল হুসাইন পরবর্তীতে একটি টাওয়ার নির্মাণ করেন যেন দূর থেকে জল্লাদখানা বধ্যভূমি দেখা যায়। পরিদর্শন শেষে সকলে বৈঠকখানায় এসে বসেন। স্থপতি ড. আবু সাঈদ মন্তব্য লেখেন, ‘যতবারই এখানে আসি দেশের জন্য যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের সাথে নতুনভাবে পরিচিত হই। তাঁদের প্রতি রইল অনেক শ্রদ্ধা। ২৬ নভেম্বর এই জল্লাদখানার স্থপতি রবিউল ভাইয়ের মৃত্যুদিন। রবিউল ভাইসহ সকল ব্যক্তিবর্গ যারা এই স্থাপনা ইতিহাস সংরক্ষণ করেছেন তাঁদের প্রতি রইল শ্রদ্ধা ও মঙ্গল কামনা করি। স্থপতি ড. মুহ. নওরোজ ফাতেমী মন্তব্য লেখেন ‘জল্লাদখানা বধ্যভূমি মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতার এক অন্যতম নিদর্শন। এর সংরক্ষণে স্থপতি রবিউল হুসাইনের স্থাপত্যকর্মকে আমি স্থপতিদের পক্ষ থেকে এক অভিনব প্রয়াস বলে মনে করি। স্থপতি রবিউল হুসাইনের মৃত্যুদিবসে তাঁর, সকল শহীদের এবং শহীদ পরিবারের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।’ স্থপতি আবু মুসা ইফতেখার মন্তব্যে লেখেন, “জল্লাদখানার নাম অনেক শুনেছি। দেখা হয়নি। একটা স্থাপত্যকর্ম কত ব্যাপকভাবে গোটা দেশের বধ্যভূমিগুলো ও এর নৃশংসতাকে এতো প্রকটভাবে সংযুক্ত করতে পারে তা না দেখলে এভাবে জানা হতো না। এখানে ‘ রবিউল হুসাইন’-কে উপলব্ধি করলাম।”

**প্রমিলা বিশ্বাস**
জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

# পরিচ্ছন্ন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পেছনের গল্প

শরণার্থীদের ছবিগুলোর কাছে গিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকে, ভাবতে থাকে তার দাদা-দাদি, বাবা জেঠা আর পিসিদের কথা। ৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদেরকে দেশ ত্যাগ করে যেতে হয়েছিল ভারতে, হয়েছিল শরণার্থী। শরণার্থী শিবিরের ছবিগুলো দেখে বারে বারে তাদের কথা মনে করেই কষ্টে হাহাকার করা অনুভূতি হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচ্ছন্নতা কর্মী দীপ্তি রানীর। মাঝেমাঝে তার ইচ্ছে করে কাজকর্ম রেখে গ্যালারিতে গিয়ে নিজের দেশের ইতিহাস জানতে। দারিদ্রের নির্মম সত্যের কাছে মৌলিক অধিকার শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল বলে বেশিদূর চালিয়ে যেতে পারেনি পড়াশোনা। এতদিন ধরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কাজ করেও নিজের দেশের গৌরবময় ইতিহাস জানতে পারেনি বলে মনের মধ্যে পীড়া দেয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আরেক পরিচ্ছন্নতা কর্মী মামুন। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকার যদি বাস্তবেই সবার জন্য হতো তাহলে হয়তোবা মামুন এখন দেশের কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বসে মনোযোগ দিয়ে অধ্যাপকদের কথা শুনতো। তারই বয়সী ছেলেরা যখন নিজের দেশের ঐতিহ্যের কথা, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের কথা জানতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ঘুরে বেড়ায় হয়তো-বা সে তখন ছুটে চলে বালতি হাতে আগত দর্শনার্থীদের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দিতে। স্কুল কলেজ থেকে আগত শিক্ষার্থীদের যখন গ্যালারিতে দায়িত্বে থাকা আপুরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে তারও ইচ্ছে করে সেখানে গিয়ে নিজের দেশকে জানতে। নতুন যৌবনের দুর্বার তারুণ্যে অকপটে স্বীকার করে নেয় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সে তেমন কিছুই জানে না। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চে ভাষণ দিয়েছিল এসবই। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কাজ করে যদি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কেই না জানতে পারে তাহলে আর কখনো মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানা হবে কিনা এমন সন্দেহ আছে মামুনের। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আর পাঁচজন মানুষের মতো তারও অধিকার আছে নিজের দেশ সম্পর্কে জানার।

দীপ্তি রাণী কিংবা মামুনের মতো আরও অনেকেরই পারিবারিক কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে বঞ্চিত হতে হয়েছে শিক্ষার আলো থেকে। তাদের মতো অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না, অথবা জানলেও অসত্য অনেক কিছুই সত্য বলে জানে। অথচ তারা সমাজের একটা শ্রেণির কাছে মুক্তিযুদ্ধকে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে উপস্থাপন করে।

**ইয়াছমিন লিসা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর**

# চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার স্মৃতিময় স্থান

ঐতিহাসিক সোনামসজিদ, নাচোলের রাণী ইলা মিত্র ও টোকাই'র স্রষ্টা শিল্পী রফিকুন্নবী রনবীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ২০১৪, ২০১৯-এর পর তৃতীয় বারের মত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩ মাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নবীন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের নিকট মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান এবং তথ্য সংগ্রহের কাজ করে যাচ্ছে। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের নবীন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার সময় স্থানীয়দের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থানের তথ্য জানা যায়। সংগৃহীত স্মৃতিময় স্থানের কিছু তথ্য-

রহনপুর আহম্মদী বেগম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় : রহনপুর আহম্মদী বেগম (এবি) উচ্চ বিদ্যালয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগার ভবনটি রহনপুরের প্রধান নির্যাতন সেল হিসাবে ব্যবহার করত। দোসর রাজাকারের সহায়তায় আশপাশের গ্রাম থেকে মুক্তিকামী লোকদের ও রহনপুর রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন থেকে যাত্রীদের ধরে বিদ্যালয়ের টর্চার সেলে বন্দি করে রাখত। টর্চার সেলে বন্দিদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে বেয়নেট খুঁচিয়ে গুলি করে হত্যা করা হত।

বিনোদপুর উচ্চ বিদ্যালয় : ১৩ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী নড়াইল শহরে প্রবেশ করে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিদের নিয়ে শান্তি কমিটি ও রাজাকার দল গঠন করে এবং রাজাকার দলের নেতৃত্ব দেন মওলানা মো. সোলাইমান। মওলানা সোলাইমানের নেতৃত্বে রাজাকার দল নড়াইল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাসভবন দখল নিয়ে শান্তি কমিটির অফিস স্থাপন করে। পরবর্তীতে রাজাকারদল বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরীহ লোকদের ধরে এনে এখানে নির্যাতন করত। এছাড়া আশেপাশের যুবতী মেয়েদের ধরে এনে পাশাবিক নির্যাতন করা হত। বর্তমানে বিদ্যালয়ের এই ভবনটির অবস্থান নড়াইল পৌরসভার বিপরীতে।

গোমস্তাপুর থানা ক্যাম্প : পাকিস্তানি বাহিনী নড়াইল শহর দখল নিয়ে ডাক বাংলোয় ক্যাম্প স্থাপন করে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে গোমস্তাপুর বাজারের হিন্দু প্রধান তিনটি গ্রামে প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে অভিযান চালিয়ে বাড়ি ঘরে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বাড়িঘরে ঢুকে খুঁজে খুঁজে পরিবারের যুবক-বৃদ্ধ যাকে পেয়েছে সবাইকে ধরে থানা ক্যাম্প চত্বরে নিয়ে আসে। এদিন সেখানে ৩৫ জনকে ধরে এনে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে গুলি করে হত্যা করে এবং হত্যার পর কেরোসিন ঢেলে লাশগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। আগুনে পোড়া লাশগুলো পরে থানা চত্বরে গর্ত খুড়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়।

গণপূর্ত ভবন : গণপূর্ত অফিসটি ছিল পাকিস্তানি অফিসারদের বাসস্থান ও প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র। এখানে তাদের দোসরদের সহায়তায় বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরীহ মুক্তিকামী জনতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে এনে নির্যাতন করত।

কৃষ্ণগোবিন্দপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় : এই বিদ্যালয়টি নাচোলের রাণীমা ইলা মিত্রের স্মৃতি বিজড়িত। ১৯৪৫ সালের শেষ দিকে রমেন মিত্র ও তার বন্ধু আলতাফ মিয়া মিলে জমিদার বাড়ির অদুরে কৃষ্ণগোবিন্দপুরে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে ইলা মিত্র নিরক্ষতা দূরীকরণকল্পে সেখানে শিক্ষকতা করেন এবং এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই সংগ্রামী জীবন শুরু। এক সময় তিনি কৃষক আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়লে শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে দেন। আজ সেই আন্দোলন ইতিহাসে নাচোল বিদ্রোহ বা নাচোলের কৃষক আন্দোলন বা তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনটি ভেঙ্গে সর্বশেষ ইলা মিত্রের স্মৃতি বিজড়িত শেষ স্মৃতি চিহ্নটুকুও মুছে ফেলেছে।

সবুজ সংঘ : ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রচারণা ও প্রার্থী মনোনয়নের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ তৎকালীন নবাবগঞ্জ মহকুমা সফর করেন। সেই নির্বাচনী সফরটি ছিল ১৯৭০ সালের ১৯ এপ্রিল। শহরে আসার পর প্রথমে বর্তমান নবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত বর্তমান সবুজ সংঘ ক্লাবের সামনের পশ্চিমে ও বর্তমান আওয়ামী লীগ অফিসের উত্তর অংশে অবস্থিত ভবনে (বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত) অবস্থান করেন। সেখানে দলীয় নেতা ডা. আ আ ম মেসবাহুল হক বাচ্চু, ডা. মইন উদ্দিন আহমদ মন্টু, বশির চৌধুরীসহ প্রমুখদের সাথে বৈঠক করেন।

কাশিয়াবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ রাজাকার ক্যাম্প : পাকিস্তানি বাহিনী এপ্রিল মাসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার থানা শহর এলাকা গুলোতেও ক্যাম্প স্থাপন করেন। তাদের কাজের সহযোগিতার জন্য প্রতিটি থানা এলাকায় রাজাকার বাহিনী গড়ে তোলেন। গোমস্তাপুর থানায় কুখ্যাত রাজাকার কমান্ডার আ. খালেক কাশিয়াবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন দখল নিয়ে ক্যাম্প স্থপন করেন। এই ক্যাম্প থেকে রাজাকার কমান্ডার আ. খালেক সহযোগিদের নিয়ে এলাকার নিরিহ লোকদের উপর অত্যাচারের নীলনকসা করতেন।

রহনপুর ইপিআর (বিজিবি) ক্যাম্প : গোমস্তাপুর থানা পাকিস্তানি বাহিনী নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পর পাকিস্তানি বাহিনী রহনপুর ইপিআর (বর্তমানে বিজিবি) ক্যাম্পে সেনা ছাউনী গড়ে তুলেন। ইপিআর ক্যাম্প সেনা ছাউনীতে আশে পাশের গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে আসা লোকদের নির্যাতন করে স্টেশন সংলগ্ন খালি জায়গায় নিয়ে হত্যা করা হয়।

মোকরমপুর ঘাট বাংকার : পূণর্ভবা ও মহানন্দা নদীর তীরে পাকিস্তানী বাহিনী সারি সারি বাংকার খনন করে অবস্থান নেন এবং বাংকার গুলো ছিল সাপের মত আঁকা বাঁকা ও সুরক্ষিত। মহানন্দা নদীর তীরে বোয়ালিয়া গ্রামে ছিল ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান। মুক্তিযোদ্ধারা যাতে নদী পার হয়ে গোমস্তাপুরে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে বাংকারে অবস্থান করত। দোসর রাজাকারের সহায়তায় গ্রাম থেকে যুবতী নারীদের ধরে এনে বাংকারে অমানুষিক নির্যাতন চালাতো। বাংকারে নারী নির্যাতনের নীরব স্বাক্ষী এলাকার সাধারণ জনগণ। দেশ স্বাধীনের পর এই সব বাংকারের ভিতরে অনেক শাড়ি, ব্লাউজ ও চুড়ির ভাংগা অংশ পাওয়া যায়। কালক্রমে আজ বাংকারের জায়গায় গড়ে উঠেছে আমের বাগান।

তাশেম বোডিং : ১৯৭০ সালের ১৯ এপ্রিল নির্বাচনী প্রচারণা ও মনোনয়ন প্রার্থী বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংগে কামারুজ্জামান ও মজিবুর রহমান (মিয়া মজিবুর) নবাবগঞ্জ মহকুমায় নির্বাচনী সফর করেন। শহরে প্রবেশের পর প্রথমে সবুজ সংঘ ক্লাবে সেখানকার স্থানীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করে মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রামের জন্য সদর থানার সামনে মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত তাশেম বোডিং-এ আসেন এবং ১৬নং কক্ষে অবস্থান করেন।

**রঞ্জন কুমার সিংহ**
কর্মসূচি কর্মকর্তা

# ফিলিস্তিনিদের লড়াইয়ের সাথে সংহতি: চলচ্চিত্র 'ওয়াজিব' প্রদর্শনী

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে গত ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ সিনেমা প্যালেস্টাইন বাংলাদেশ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চলচ্চিত্র কেন্দ্র যৌথভাবে এক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। সিনেমা প্যালেস্টাইন বাংলাদেশ ১ হতে ৯ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সিরিজ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। তারই অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ফিলিস্তিনি চলচ্চিত্র 'ওয়াজিব' প্রদর্শিত হয়। ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

শুরুতে সিনেমা প্যালেস্টাইন বাংলাদেশ-এর আয়োজক লেখক ও গবেষক পারসা সানজানা সাজিদ এবং লেখক ও শিক্ষক ওলিউর সান প্রদর্শনী নিয়ে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তারা ফিলিস্তিনের গাজায় নিরীহ মানুষের উপর ইজরাইল প্রতিরক্ষা বাহিনী দ্বারা পরিচালিত চলমান সহিংসতার কথা তুলে ধরেন। এরপর পারসা সাজিদ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও ট্রাস্টি মফিদুল হককে এই প্রদর্শনীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য দেয়ার আহ্বান জানান। মফিদুল হক তার বক্তব্যে গাজায় চলমান সহিংসতায় এই প্রদর্শনীর প্রভাব তুলে ধরেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের ফিলিস্তিনের সাথে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বাংলাদেশি কবিদের ফিলিস্তিনিদের নিয়ে লেখা কবিতার কথা বলেন।

প্রদর্শিত চলচ্চিত্র 'ওয়াজিব' নাজারেথ শহরের একজন বাবা ও তার ছেলে এবং তাদের পরিবারের কাহিনীর উপর নির্মিত। ৯৩ মিনিটের এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন পরিচালক অ্যানেমারি জাসির। চলচ্চিত্রটি '২০১৭ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এর সমসাময়িক বিশ্ব সিনেমা বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছিলো।

**এম. ফারহাতুল হক**, সহ-সমন্বয়ক, চলচ্চিত্র কেন্দ্র

# দক্ষিণ কোরিয়ায় | গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তি বিষয়ক সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অংশগ্রহণ

দক্ষিণ কোরিয়ার সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান 'এশিয়া কালচার সেন্টার (এসিসি)' গত ২৩ ও ২৪ নভেম্বর ২০২৩ দুই দিনব্যাপী দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়াংজুতে 'গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তি' শীর্ষক প্রতিনিধি সভার আয়োজন করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধি হিসেবে আমি সভায় যোগদান করি। সভায় দক্ষিণ কোরিয়ার এশিয়া কালচার সেন্টারের প্রেসিডেন্ট Lee kang-hyun এবং হেড অব দ্য এক্সচেঞ্জ এন্ড পাবলিক রিলেশন Kim Deong-soo-সহ ৪জন, দক্ষিণ কোরিয়ার মে-১৮ জাদুঘরের-এর পরিচালক Hong in-hwa এবং চিফ কিউরেটর Im Jong-young-সহ ৩জন, দক্ষিণ কোরিয়ার জেজু ৪-৩ পিস ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য Cho Jin-tae এবং মেমোরিয়াল টিমের ম্যানেজারসহ ৪জন, The state Rehabilitation Management Commission of Mangolia-এর চেয়ারপার্সন Saldan Odontaya এবং কমিশনের সচিব Ganbaatar Tuguldur-সহ ১০জন, ভিয়েতনামিস উইমেন্স মিউজিয়াম-এর পরিচালক Nguyen Thi Tuyet এবং ইনভেনটরি ও কনসারভেশন বিভাগের উপপ্রধান Do thi Van Anh- সহ ৫জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে মোট ৩০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

২৩ নভেম্বর সকাল ১০টায় এশিয়া কালচার সেন্টারের ৬নং গ্যালারিতে সিরিয়া, লেবানন ও দক্ষিণ কোরিয়ার ছয়জন চিত্রশিল্পীর বিশ শতকে অঙ্কিত চিত্র-প্রদর্শনী পরিদর্শনের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রদর্শনী দেখা শেষে এসিসি ভবন ও অঙ্গণ ঘুরে দেখানো এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রতিনিধিদের অবহিত করা হয়।

দুপুরের খাবারের পর এসিসি'র ২নং মিটিং রুমে মঙ্গলিয়ান লোকসঙ্গীতের সুরে যন্ত্রবাদনের মাধ্যমে প্রতিনিধি সভা শুরু হয়। যন্ত্রবাদনের পর নেটওয়ার্কের অন্যান্য সদস্য প্রতিষ্ঠানের সাথে এসিসি-র যৌথ কাজের একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও প্রদর্শিত হয়। ভিডিও প্রদর্শনীর প্রায় অর্ধেকটা জুড়েই ছিল এসিসি-র সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে ২০১৯ সালে আয়োজিত প্রদর্শনীর ভিডিও ও স্থিরচিত্র। ভিডিও প্রদর্শনীর পর নেটওয়ার্ক সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক কীভাবে আরও জোরদার করা যায়, নেটওয়ার্কের সদস্য সংখ্যা কীভাবে বাড়ানো যায়, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শান্তি-সম্প্রীতি এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক সদস্যদের মধ্যে কী ধরনের যৌথ কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ করা যায় এবং কী কী বিষয় বিনিময় হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের আবতারণা করে এশিয়া কালচার সেন্টারের প্রেসিডেন্ট Mr. Lee Kang-hyun আলোচনার সূত্রপাত করেন। অংশগ্রহণকারী ৬টি জাদুঘরের প্রতিনিধি এ ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব মতামত তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে যৌথভাবে অথবা পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রদর্শনী আয়োজন, শিল্প ও সংস্কৃতির বিনময়, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, ইন্টার্নশিপ-এর জন্য কর্মী বিনিময়, গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ এবং যৌথ প্রকাশনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাবনা দেয়া হয়। এবং এ প্রসঙ্গে কোরিয়া ও মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের নিয়ে কোরিয়ায় অভিবাসী বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতা শেখ আল মামুনের Why not প্রামাণ্যচিত্রের যা ২০২০ এর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অষ্টম প্রামাণ্যচিত্র উৎসবে বেস্ট ফিল্ম এওয়ার্ড পায় তার উল্লেখ করা হয়। প্রতিনিধিদের আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে আগামী বছরের (২০২৪) জন্য থিম নির্ধারিত হয় Culture and Art: Craft Works in Asia. প্রতিনিধি সভা শেষে অংশগ্রহণকারী জাদুঘরগুলোর পক্ষ থেকে Power Point উপস্থাপনা উপস্থাপন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে দুইটি উপস্থাপনা উপস্থাপন করা হয়। Documenting 1971 after 50 years: Perspective of a Bangladeshi Film-maker শিরোনামের উপস্থাপনাটি জাদুঘরের ফিল্ম সেন্টারের পরিচালক তারেক আহমেদের উপস্থাপন করার কথা থাকলেও তিনি শেষ মুহূর্তে যেতে না পারায় আমি উপস্থাপন করি এবং আমার নিজের Education and Outreach of the Liberation War Museum, Bangladesh শীর্ষক উপস্থাপনাটিও উপস্থাপন করি। উপস্থাপনা দু'টি ব্যাপক প্রশংসিত হয়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের নিয়ে জাদুঘরের আউটরিচ কর্মসূচি নিয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দ ভীষণ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মে -১৮ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শনের মধ্যদিয়ে দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদের ১৬০০ শতকে নির্মিত Soswawon Garden পরিদর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রায় সাতশত বছরের পুরনো কোরিয়ান স্থাপত্য ও জীবন যাত্রার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। গার্ডেন পরিদর্শন শেষে ম্যাপেল বাগান পরিদর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুর ২টায় এশিয়া কালচার সেন্টারের প্রেসিডেন্টের সাথে আমার পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাতের সময়ে জাদুঘরের পক্ষ থেকে এসিসি-কে একটি নকশি কাঁথা উপহার হিসেবে এবং কিছু প্রকাশনা হস্তান্তর করা হয়। নকশি কাঁথা পেয়ে তিনি ভীষণ আনন্দিত হন।

এশিয়া কালচার সেন্টারের ব্যাম্বু গার্ডেনে The Modern history of Mongolia : Political Repression and Cultural Destruction' শীর্ষক প্রদর্শনী উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে দুই দিনব্যাপী সম্মিলনের সমাপ্তি ঘটে।

এশিয়া কালচার সেন্টারের আতিথিয়তা ও সহযোগিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সর্বোপরি আনন্দের বিষয় সম্মিলনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

**রফিকুল ইসলাম**
ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি)

The International Coalition of Sites of Conscience is a global network of historic sites, museums, and memory initiativs connecting past struggles to today's movements for human rights and social justice.

**LWM Bangladesh is a member of the International Coalition of Sites of Conscience.**

## ICSC Statement on the Crisis in Gaza

**To Members of the International Coalition of Sites of Conscience,**

What we are witnessing today in Gaza is a moral failure and a humanitarian disaster that will plunge the world into deeper polarization and renewed cycles of violence.

In just over six weeks more than 12,000 thousand civilians have been killed in Gaza, including 5,000 children. Thousands are severely injured, unable to receive the medical care they need, and many more remain under rubble in need of rescue. Patients, including premature babies, are dying in hospitals where basic medical care can no longer be provided because of Israel's blockade and attacks on hospitals. And thousands of families are desperately awaiting news of loved ones who have been missing, abducted or killed.

Over a month into this humanitarian disaster, the world has failed to stop what amounts to war crimes and crimes against humanity according to the United Nations and prominent international human rights organizations, as many turn a blind eye, or in some cases, actively support Israel's escalation of violence.

The normalization of conflict and death, the absence of empathy and the prioritization of certain lives over others is a failure of our shared humanity and our promise of "Never Again."

**Since its founding in 1999, the International Coalition of Sites of Conscience (ICSC) has learned critical lessons from dealing with conflict in different contexts around the world–the most relevant in this context being:**

**1. Violence never results in peace and security**.

Violence, be it structural or active, never results in or restores peace and security. Violence only breeds more violence, reduces empathy and compassion for the other and prevents warring factions from participating in a dialogue.

Israel's ongoing attacks against Gaza's civilian population in the name of self-defense is not only unlawful, but is contributing to global instability and fueling new cycles of violence, as we are already seeing in the growing number of anti-Arab, Islamophobic and antisemitic acts around the world.

**The International Coalition of Sites of Conscience calls for:**

- A total and immediate ceasefire;
- The provision of desperately needed humanitarian aid for the people of Gaza;
- The release of all Palestinians arbitrarily detained in Israeli prisons
- The release of all Israelis held hostage by Hamas; and
- The right of both Palestinians and Israelis to enjoy equal rights.

# সিএসজিজে একাদশ মাসিক বক্তৃতা: লেফটেন্যান্ট জেনারেল অশোক কে মেহতা

গত ৩১শে অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) এবং জার্মান দূতাবাসের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে মাসিক বক্তৃমালার একাদশ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বে 'ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ : শান্তিরক্ষক হিসেবে চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডটের ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল অশোক কে মেহতা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের গবেষণা সহকারী তাবাসসুম নিগার ঐশী।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল অশোক কে মেহতা ১৯৫৭ সালে কমিশন লাভ করেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর পঞ্চম গোর্খা রাইফেলস রেজিমেন্টে যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বাংলাদেশের দিনাজপুর/বগুড়ায় যুদ্ধ করেছিলেন। তার গবেষণার মূল ফলাফল সম্পর্কে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সাবেক চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডট এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে যোগাযোগ এবং উইলি ব্রান্ডট বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কতটা জোরালোভাবে সমর্থন করেছিলেন সে সম্পর্কে কথা বলেছেন।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল অশোক কে মেহতা বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, একাত্তরে ভারত, পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে একটি খুব কঠিন সংঘাত-পরবর্তী পরিস্থিতি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করার জন্য ইতিহাসের সেই বিশেষ অংশটি স্মরণ করা দরকার। তিনি জানান, তার কাছে উইলি ব্রান্ডটের যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধের পরে আদান-প্রদান করা চিঠি রয়েছে, যা ভারতের ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ইয়াহিয়া খান, বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান এবং উইলি ব্রান্ডট-এর মাঝে আদান প্রদান করা হয়েছিলো।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত শুভ সময়। ভারতীয় সৈন্যদের অবদানের স্মরণে আপনাদের সরকার দারুন কাজ করেছে, বিশেষ করে শহিদ এবং তাদের পরিবারের জন্য। যেমন আপনাদের সরকার শহিদদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। আমরা এখন আশুগঞ্জের কাছে স্মৃতিসৌধ পেতে যাচ্ছি। ২০২১ সালে শেখ হাসিনা এবং নরেন্দ্র মোদি যৌথভাবে এটি স্থাপনের জন্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আগামী বছর এটি উদ্বোধন হতে পারে। এছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের উপর নির্মিত চলচ্চিত্রটি রয়েছে, যা ভারতের সম্মুখ সারির পরিচালক শ্যাম বেনেগাল করেছেন। তাই এটা আমাদের দুই দেশের জন্য খুবই উপযোগী সময়।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল অশোক কে মেহতা আরও বলেন, সোভিয়েত চুক্তির গুরুত্ব ছিল যে, ভারত যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে সক্ষম হয়েছিল যদিও ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান পশ্চিমে বিভিন্ন আক্রমণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি ছিল তা হল পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। স্ট্যানলি ওয়ালপোর্ট তার বইতে বলেছেন, ইয়াহিয়া খান যদি পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নিয়ে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করতেন তাহলে বাংলাদেশ হতো না।

উইলি ব্রান্ডট অনেক চিঠি আদান-প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১০ই নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা হলে তিনি পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত ১০ মিলিয়ন উদ্বাস্তুদের থাকার জন্য ভারত যা করেছে তার প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল ভাব পোষণ করেন এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি তার সংহতি প্রকাশের পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা উভয়ই ব্যবহার করেছে। ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানির ভূমিকার মৌলিক সারাংশ হলো, ভারতের সাথে চুক্তি এবং সেই দিনগুলোতে এটি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল। ১০ মিলিয়ন উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসনে ডয়েচ মার্ক নবনির্মিত বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশ ও FRG-এর মধ্যে কথোপকথনের জন্য এম আর সিদ্দিকী (শেখ মুজিবুর রহমানের বিশেষ দূত), রাষ্ট্রদূত চৌধুরী (যিনি জার্মানিতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হন), ওয়াল্টার শিল্ড (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) কার্ল মশ, উইলি আইশলার প্রমুখের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই সকল মানুষের সংযোগ ছিল। ভুট্টো বলেছিলেন যে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে প্রত্যাবাসন না করা পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন না এবং তিনি তাদের বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা করেননি। এগুলো ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানে ৩ লাখ বাঙালি ছিল। বাংলাদেশে ২ লক্ষ ৫০হাজার বিহারী এবং ৯০০০০ যুদ্ধবন্দী ছিল।

এই প্রত্যাবাসন ঘটেছিল কারণ উইলি ব্রান্ডট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানির উদাহরণ তুলে ধরে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছিল। যার ফলে ৩ লক্ষ বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। অবশেষে ৯ এপ্রিল, ১৯৭৪-এর ট্রাইপোডাইড চুক্তি হয়েছিল যা মানবিক সমস্যার সমাধানে সহায়তা করেছিল।

সবশেষে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক অভিযান।

প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শেষ হয় মাসিক বক্তৃতামালার একাদশ পর্ব।

রিহি

**লামিয়া আফরোজ রিহা**
স্বেচ্ছাসেবক, সিএসজিজে

## কক্সবাজারে 'বিজয় উৎসব'-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিবেদিত প্রদর্শনী

কক্সবাজার আর্ট ক্লাব আয়োজিত 'মুক্তিযুদ্ধের বিজয় উৎসব' উদ্‌যাপিত হচ্ছে কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। উৎসবের প্রতিপাদ্য 'মুক্তিযুদ্ধের বিজয়-বাঙালির ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার'। সেখানে চলবে মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশনা, চিত্রপ্রদর্শনী, মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ, গণসংগীত, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, মূরাল প্রদর্শনী ইত্যাদি। এই বিজয় উৎসবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিকল্পিত 'বাংলাদেশে গণহত্যা স্মরণ' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী নিবেদিত হয়েছে কক্সবাজার আর্ট ক্লাবের সহযোগিতায়। উৎসব প্রাঙ্গণে আয়োজিত সেমিনারে অংশ নেন জাদুঘরের প্রতিনিধি তাবাসসুম ইসলাম তামান্না ও আরিফা সোহানা অহনা।

**তাবাসসুম ইসলাম তামান্না**
গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official